মনে পড়ে

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর পুণ্যস্মৃতি

স্বামী চেতনানন্দ

[রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ পরমপূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের পূতসঙ্গধারায় দীর্ঘদিন স্নাত হয়েছেন লেখক। বর্তমানে আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ তাঁর সেই অন্তরঙ্গ স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছিলেন গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, অদ্বৈত আশ্রমে। পূজনীয় মহারাজের অনুমতিক্রমে সেই অমূল্য স্মৃতি নিবোধত-র পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হল।]

তুলসীদাস একটি দোঁহায় বলেছেন—আমি সাধু, অসাধু উভয়কে প্রণাম করি। কারণ উভয়েই আমার যন্ত্রণার কারণ। সাধু যখন আমার কাছ থেকে চলে যান, আমি কষ্ট পাই। আর অসাধু যখন আমার কাছে আসে, তখনও কষ্ট পাই। সুতরাং আমি উভয়কেই প্রণাম করি।

স্বামী গম্ভীরানন্দের স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল। আমি তাঁকে তিরিশ বছর ধরে জানতুম। সাত বছর ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে থেকেছি। তিনি এখন নামরূপের পারে—তাঁকে কথার দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে চাই না। করা উচিতও নয়। অথচ আমাদের মন মায়া-মমতা, শ্রদ্ধাপ্রীতির ডোর দিয়ে বাঁধা, তাই প্রিয়জনকে স্মৃতির রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। দুটো শব্দ আছে—স্মৃতি আর বৃত্তি। মানসপটে ক্রমাগত বৃত্তি ওঠে নামে কিন্তু বিলুপ্ত হয় না। সেগুলো সব স্মৃতিতে চলে যায়। ইচ্ছা করলে আমরা স্মৃতি থেকে বৃত্তিগুলোকে টেনে তুলতে পারি। কেউ যদি বলে ছোটোবেলায় কে আপনার শিক্ষক ছিলেন, ঝট করে আমি পঞ্চাশ-ষাট বছরের স্মৃতি থেকে বৃত্তি তুলতে পারি। স্মৃতি আর বৃত্তির খেলা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। মানুষ স্বপ্নশীল জীব, কল্পনা করতে ভালোবাসে। আমরা স্মৃতি ও স্বপ্ন দিয়ে এই জগৎ তৈরি করি। রানি রাসমণি কাশীতে তীর্থ করতে যাচ্ছিলেন। স্বপ্নে মা কালী বললেন—তোর আর কাশী গিয়ে কাজ নেই, এই গঙ্গার তীরেই একটি মন্দির তৈরি কর। স্বপ্ন দেখে ওই বিরাট দক্ষিণেশ্বর মন্দির হল।

তারপর চরিত্র। আমরা ছোটোবেলায় ইংরেজি proverb মুখস্থ করতাম—Money is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. এই চরিত্র কী করে গঠন করা যায়? সেটাই আসল কথা। আমরা দেখি স্বামী গম্ভীরানন্দের ছিল অটুট চরিত্র। It was his character which spoke. চরিত্র কীভাবে তৈরি হয়? স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখবেন—

Whatever we do, whatever we think, they leave some impression in the mind. Sumtotal of those impressions form habit and habits form character.—আমরা যা করি, যা চিন্তা করি তারা অবচেতন মনে impression রেখে যায়। সেই impression-এর সমষ্টি থেকেই

অভ্যাস হয়, অভ্যাস থেকে চরিত্র হয়। কীভাবে চরিত্র গঠিত হয়? মহাভারতের শান্তিপর্বে একটি সুন্দর গল্প আছে। প্রহ্লাদের দানের তুলনা ছিল না। ইন্দ্র ভাবলেন—ও দান করে এত পুণ্যলাভ করেছে, আমার স্বর্গরাজ্য নিয়ে নেবে। তিনি ব্রাহ্মণবেশে এসে প্রহ্লাদকে বললেন—শুনেছি তুমি খুব দাতা। তোমার কাছে ভিক্ষা করতে এসেছি।

—বলুন। যা চান তাই দেব।

—আমি আপনার চরিত্রটা চাই।

—আচ্ছা, নিয়ে নিন।

তারপর ভাবলেন, কী করলাম? চরিত্রটা দিয়ে দিলাম? একটু পরে দেখলেন শরীর থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে আসছে।

—কে তুমি? কেন আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

—আমার নাম সত্য। যেখানে চরিত্র নেই, সেখানে আমি থাকি না।

আর একটু পরে আর একটা জ্যোতি শরীর থেকে বেরিয়ে এল।—কে তুমি? কেন চলে যাচ্ছ?

—আমার নাম ধর্ম। যেখানে চরিত্র ও সত্য থাকে না, সেখানে আমি থাকি না।

আর একটু পরেই দেখছেন আর একটা জ্যোতি শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে।

—কে তুমি? কেন যাচ্ছ?

—আমার নাম শ্রী। যেখানে চরিত্র, সত্য, ধর্ম থাকে না, সেখানে আমি থাকি না।

তারপর আর একটা জ্যোতি শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে।

—কে তুমি?

—আমার নাম বল—শক্তি। যেখানে ওরা থাকে না সেখানে আমি থাকি না।

এমনি করে প্রহ্লাদ শ্রীহীন হয়ে গেলেন। চরিত্রই হল মানুষের পরিচায়ক। I am what my character is. কৃষ্ণ বলছেন, যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ—মানুষ তার শ্রদ্ধাকে, চরিত্রকে রিপ্রেজেন্ট করে।

স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে দেখতাম, ঠিক ঠিক সাধু। বেদান্তী সাধু। সম্পূর্ণভাবে কামিনী-কাঞ্চনমুক্ত। নামযশ মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। কেউ প্রশংসা করলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতেন। আর একটা ব্যাপার, যে-সাধুর কাছে অন্য সাধুরা মাথা নোয়ায়, সেই সাধুর ভিতর কিছু আছে। নয়তো সাধু সাধুকে মাথা নোয়াবে না। আর যে-জিনিসটা বিশেষভাবে আমার মনে জাগে সেটা হল, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, তাঁদের ষোলো জন পার্ষদ—এঁদের সবকিছু আমরা সংরক্ষণের চেষ্টা করেছি। পরবর্তী কালে যাঁরা সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়েছেন তাঁদের অবদানও কোনও অংশে কম নয়। আমরা তাঁদের স্মৃতি দিয়ে একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকা বের করি বেলুড় মঠ থেকে। কিন্তু সঙ্ঘ থেকে তাঁদের নিয়ে বড়ো বই হয়নি। কারণ এতে প্রতিযোগিতা হতে পারে—আমার গুরু বড়ো, তোমার গুরু ছোটো ইত্যাদি ভাব আসতে পারে। সেজন্য আমরা এর মধ্যে যাই না।

এ-প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। আমি স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজীর কাছে একবছর নয় মাস ছিলাম। তিনি ঢাকায় স্বামীজীকে তিনবার দেখেছেন। সে ১৯০১ সালের কথা, তখন তাঁর বারো বছর বয়স। তারপর গেছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে দীক্ষা নিতে। ব্রহ্মানন্দজী দীক্ষার ব্যাপারে খুব হ্যারাস করতেন—চার-পাঁচ বছর ধরে। আবার পাশের সেবককে বলতেন—দেখ, বড়ো হ্যারাস করছি, ভালো দেখাচ্ছে না, তাই না? খুব হ্যারাস না করে দীক্ষা দিতেন না। বাজিয়ে নিতেন। যাই হোক, তারপর চুপিচুপি বীরেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে সৎপ্রকাশানন্দজী মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে গেলেন জয়রামবাটীতে। পথে তিনি অসুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। ব্রহ্মানন্দজী শুনে বলেছিলেন—শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। পরবর্তী কালে দীক্ষা দিয়েছিলেন। পরে সৎপ্রকাশানন্দজী মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে বললেন—

আচ্ছা, কেউ মায়ের কাছ থেকে, কেউ মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। কোনও পার্থক্য আছে? মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—না, কোনও পার্থক্য নেই, একই গঙ্গার জল দুটি নল দিয়ে আসছে। একই ঠাকুরের শক্তি, মায়ের ভিতর দিয়ে আসছে, মহারাজের মধ্য দিয়েও আসছে। সুতরাং আমার গুরু বড়ো তোমার গুরু ছোটো এসব মতুয়ার বুদ্ধি।

ইতিহাস কাকে মনে রাখে? তার পাতায় কারা স্থান পায়? ইতিহাসের সোনার তরীতে স্থান খুব অল্প ও সংকীর্ণ। তাই সূক্ষ্ম বিচার করে তাতে যাত্রী তুলতে হয়। এ-তরীতে আমজনতার স্থান নেই। এমনকী ধনী, বিলাসীদেরও নয়। এই তরীর যাত্রী তাঁরাই, those who live for others—যাঁরা অপরের জন্য প্রাণ দেন, মানবকল্যাণে নিঃস্বার্থে নতুন কিছু দিয়ে যান। কঠোপনিষদের একটি মন্ত্রে আছে—সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ—জগতে মানুষ শস্যের মতো জন্মায়, শস্যের মতো মারা যায়। কেউ তাদের মনে রাখে না। যেসব ব্যক্তি কর্মের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা পৃথিবীর বুকে দাগ কেটে গেছেন ইতিহাস তাঁদেরই বরণ ও স্মরণ করে। স্বামী গম্ভীরানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এমনই এক বরণীয়, স্মরণীয় ব্যক্তি। এইসব মহান সন্ন্যাসী দধীচির মতো তিল তিল করে তাঁদের সর্বস্ব এই সঙ্ঘকে দিয়ে গেছেন। সেজন্যই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এত বিরাট, বিশাল ও সুন্দর বলে মনে হয়। এঁদেরকে লোকে ভুলে যায়, কিন্তু সঙ্ঘের পুষ্টির জন্য এঁদের অবদান অবর্ণনীয়।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী পলিটিক্স পছন্দ করতেন না। সোজা মানুষ। প্রথম যখন আমি ব্রহ্মচারী হয়ে এলাম, আমাদের এক সাধু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এখানে এসেছ কেন?

—ভগবানলাভের জন্য চেষ্টা করছি।

—ভগবানলাভ! তুমি যদি এগিয়ে যাও তাহলে লোকে মনে করবে তুমি অ্যামবিশাস, আর যদি পিছনে পড়ে থাকো তো মনে করবে তুমি লেজি। আর যদি আগেও না যাও, পিছিয়েও না যাও তাহলে মনে করবে তুমি স্টুপিড। কোনটা চাও?

—আমি লেজি হতেও চাই না, স্টুপিড হতেও চাই না।

আমি অদ্বৈত আশ্রমে এলাম ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৮। ৪ ওয়েলিংটন লেনে আমাদের আশ্রম ছিল। চারতলায় গম্ভীর মহারাজের একটি ঘর, সেখানে আবার সরিষার মহারাজের একখানি খাট। ছোটো ঘর। তিনি একখানা ক্যানভাসের চেয়ারে বসে কাজ করতেন। ম্যাসোনাইটের একটা বোর্ড ধরে লিখতেন। পিছনে ছিল জানালা, বাইরে যাতে দৃষ্টি না যায়—এমনি করে লেখাপড়া করতেন। আমি প্রথমে আসি প্রুফ রিডার হিসেবে। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, রামকৃষ্ণ সাহিত্যের যত বই অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত হত, সেগুলির প্রুফ দেখতাম। একদিন মহারাজ বললেন—দেখো ক্যালকুলেশন করে কেউ সাধু হতে পারে না, ঝাঁপ দিতে হয়। আমি বুঝলাম আমার উদ্দেশেই বলা হল। সেদিন ছিল ঠাকুরের জন্মদিন—১৯৬০, ২৮ ফেব্রুয়ারি।

তাঁর রুটিন দেখবার মতো ছিল। সাড়ে চারটেয় উঠতেন, পাঁচটায় জপধ্যান করতে বসতেন, ছটার সময় দেখতাম চিঠিপত্র লেখা শেষ, তখন একটু শাস্ত্র দেখে নিতেন। তারপরে ছটা থেকে সাড়ে ছটা ব্রেকফাস্ট। সাড়ে ছটা থেকে সাতটা ক্লাস। রবিবার ছাড়া প্রতিদিন। ব্যতিক্রম নেই। তিনি গীতা, ছান্দোগ্য উপনিষদ, কেনোপনিষদ আর ব্রহ্মসূত্র—এইগুলো শাংকরভাষ্য সমেত আমাদের পড়িয়েছেন সাত বছরের মধ্যে। তারপর তিনি কাজ আরম্ভ করতেন। এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতেন। চোখ ভালো ছিল না। মাঝেমাঝে উঠতেন। ওপরের করিডোরে পায়চারি করতেন আর গুনগুন করে গান গাইতেন। যেই চোখটা আবার ঠিক হল, আবার

কাজে বসতেন। এগারোটা পর্যন্ত কাজ, তারপর স্নান, জপ। বারোটার সময় খাওয়ার ঘণ্টা। তারপরে একটু খবরের কাগজ দেখতেন। শুতে যেতেন একটায়। ঠিক দুটোর সময় উঠে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ, চারটের সময় এক কাপ চা। তারপর ঠিক ছটার সময় বেরিয়ে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত ঘুরে আসতেন। আবার সন্ধ্যাবেলায় করিডোরে পায়চারি, গুনগুন করে গান। যেই গান বন্ধ হল, আর আওয়াজ নেই। বাকি সময় জপধ্যানেই চলে যেত। নটায় খাওয়ার সময় আবার ঘর থেকে বেরুতেন। খাওয়ার ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার। ঠিক নটা। তারপরে আমাদের ক্লাস হত আধ ঘণ্টা। ক্লাসের নিয়ম ছিল, যে নতুন জয়েন করেছে তাকেই পড়তে হবে। তা তখন আমি নতুন জয়েন করেছি, আমি পাঠক। যদি কোনও ভুল দেখতেন তাহলে বলতেন—এই, তোমার অক্সফোর্ড ডিকশনারি কী বলে একটু দেখো তো। উনি জানতেন আমি প্রস্তুত হয়ে গেছি। আমার কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারি ছিল। সে-বইটা এখনও আছে, ফেলে দিইনি। তারপরে রাত্রে শুয়ে পড়তেন। তাঁর প্রতিটি কাজের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যেত, এত পাংচুয়াল ছিলেন।

আমার কাজের জন্য অনেকসময় তাঁর ঘরে যেতে হত। একদিন দেখছি 'Reminiscences of Swami Vivekananda' বইয়ের জন্য হরিপদ মিত্রের স্মৃতি অনুবাদ করছেন। পেটে দারুণ যন্ত্রণা। হট ওয়াটার ব্যাগ পেটে চেপে কাজ করছেন। আমাদের ম্যানেজার মহারাজ বললেন—মহারাজ, একটু বিশ্রাম করুন না! মহারাজ বললেন—যাও যাও, বিরক্ত কোরো না। তারপর আমি গেছি। বললাম—আপনার একটু বিশ্রাম করা উচিত, মহারাজ। কলমটা নামিয়ে রেখে তিনি বললেন—তুমি কি আমায় গ্যারান্টি দিতে পার যে শুলে আমার ব্যথা চলে যাবে?

—গ্যারান্টির ব্যাপার নেই, শুতে হবে।

—দেখো, আমি যখন স্বামীজীর কাজ করি, আমার দেহবোধ চলে যায়। যন্ত্রণা ভুলে যাই।

আমি শিখলাম কীভাবে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করতে হয়।

এই ছিলেন গম্ভীর মহারাজ। অপূর্ব ব্যক্তি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ভারতকোষ বেরুবে চার ভল্যুম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদক। গম্ভীর মহারাজকে বলেছেন—আপনাকে তিনটে লেখা দিতে হবে—রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আর রামকৃষ্ণ মিশন। কোনও প্রবন্ধ পাঁচশো শব্দের বেশি হবে না। তা উনি তো অনেক লিখে ফেলেছেন। উনি জানতেন আমি একটু লেখাপড়ার চর্চা করি। আমাকে বললেন—ওহে ইয়ংম্যান, তুমি আমার কিছু শব্দ কমিয়ে দিতে পার? আমি বললাম—হ্যাঁ, শব্দ কমিয়ে দেব।

—কীভাবে কমাবে?

—মহারাজ, verb কমিয়ে দিয়ে adjective বাড়িয়ে দেব।

মহারাজ একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা, করো। করে বললাম—মহারাজ পাঁচশো শব্দের মধ্যে তো আনতে পারলাম না, দেড়শো-দুশো শব্দ বেশি হয়ে গেছে।

—আচ্ছা ছেড়ে দাও। তোমার হাতের লেখা মোটামুটি আমার চাইতে ভালো। তুমি কপি করে সজনীর (সজনীকান্ত দাস তাঁর সহপাঠী ছিলেন) কাছে পাঠিয়ে দাও। ও যা হয় করে নিক।

স্বামী সংশুদ্ধানন্দজী (ভবতারণ মহারাজ) প্রত্যেক পার্ষদ মহারাজের জন্মস্থানে যেতেন, একটা কমিটি ফর্ম করতেন, তারপর সেখানে একটি আশ্রম করে দিতেন। শিকড়াকুলীন গ্রাম, বারাসাত আশ্রম এই যে সব ছোটো ছোটো আশ্রম দেখছেন এইসবই ভবতারণ মহারাজের কীর্তি। উনি এলেন গম্ভীর মহারাজের কাছ থেকে মহাপুরুষ মহারাজের একটা জীবনী লিখিয়ে নিতে, বারাসাত থেকে

বেরুবে। গম্ভীর মহারাজ জীবনী লিখে দিলেন। আমি কপি করে দিলাম। ট্রাস্টি মিটিং-এ কোনও এজেন্ডা আমাকে টাইপ করতে দিলেন। আমি টাইপ করে দিলাম, উনি সাইন করলেন।—মহারাজ, আপনি পড়লেন না?—কেন, তুমি তো পড়েছ!

আমি ভুল করব না—এই অসম্ভব বিশ্বাস তাঁর।

খুব স্ট্রিক্ট ছিলেন। আশ্রমে ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে আপস করতেন না। কয়েকজন একটা ক্যারমবোর্ড এনেছে, ক্যারম খেলছে। তিনতলা থেকে চারতলায় উঠে তিনি বললেন—এখন সন্ধেবেলা, ধ্যানের সময়। আর কিছু বললেন না। তার পরদিন ক্যারমবোর্ড সরিযা রামকৃষ্ণ মিশনে চলে গেল। একদিন কয়েকজন সাধু কী একটা সিনেমার ওপেনিং-এ গেছেন। আমাকে মহারাজ বললেন—তুমি গেলে না?

—আমার ওসব ভালো লাগে না।

—ঠিকই বলেছ। দেখো সাধুজীবনে এরকম বহির্মুখী বৃত্তি ভালো না।

স্বামী সত্যব্রতানন্দের (মন্মথ মহারাজ) বাবা ছিলেন ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের মালিক। এসেছিলেন একদিন, গম্ভীর মহারাজের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন—আমার ছেলেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন, ও-ই ব্যবসা দেখে।

—সাধু হয়ে কী করে আর একজনকে বলব, তুমি বাড়ি যাও? তবে আপনার ছেলে যদি স্বেচ্ছায় বাড়ি যায়, আমি না বলব না।

মন্মথ মহারাজ যাননি। খুব বৈরাগ্য ছিল তাঁর।

অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছমাস কলকাতায় থাকেন, ছমাস মায়াবতীতে। মায়াবতী থেকে মহারাজ আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে চিঠি লিখেছিলেন—আমি ছোটোবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম, সেটাই তোমাকে লিখছি :

পারিব না একথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাবো একবার।
পাঁচজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে তাহা
পার কি না পার করো যতন আবার।
একবার না পারিলে দেখো শতবার,
পারিব না বলে মুখ করিয়ো না ভার।

সে-চিঠিখানা আমি রেখে দিয়েছি। স্বামী গম্ভীরানন্দ বলতেন—জীবনে কখনও 'পারব না' বোলো না। যদি একজন মানুষ পারে তবে আমিও পারব। এরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, আত্মবিশ্বাস রাখবে। তিনি খুব পরিশ্রম করতেন। কোনও বই প্রেসে যাওয়ার আগে পড়তেন। কমপ্লিট ওয়ার্কস-এর যত ইন্ডেক্স সব নিজের হাতে তৈরি করেছেন। আমরা দেখেছি তাঁর হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি। তারপর ব্রহ্মসূত্রের শাংকরভাষ্যের অনুবাদ—খুব কঠিন কাজ ছিল সেটা। পাঁচ বছর লাগল। স্বামী আত্মস্থানন্দজী যখন রেঙ্গুনের মোহন্ত তখন গম্ভীর মহারাজকে একটা পোর্টেবল টাইপরাইটার দেন। দেখেছি উনি নিজেই বসে পাণ্ডুলিপি টাইপ করছেন। আমি বললাম—না মহারাজ, উই শ্যাল হায়ার সামবডি।

একজন ভালো টাইপিস্ট পাওয়া গেল। যেহেতু কাজ ঠাকুর-স্বামীজীর, তাই যেকোনও কাজে তিনি কখনও না করতেন না। স্বামীজীর সেন্টিনারি-র সময় স্বামীজীর একটা নতুন চিঠি পেলাম বাংলায়। গম্ভীর মহারাজ অনুবাদ করলেন, আমাকে বলে পাঠালেন—এই চিঠিটা নির্মল মহারাজকে (মাধবানন্দজীকে) দেখিয়ে আনো। নিয়ে গেলাম। মাধবানন্দজী বললেন—গম্ভীরানন্দ দেখেছে, আবার আমার কাছে নিয়ে এসেছ কেন?

—মহারাজ, উনি বলেছেন বলেই এনেছি।

একবার পড়েই মাধবানন্দজী বললেন—নিয়ে যাও, ঠিক আছে।

খুব সম্ভবত ১৯৫৯ অথবা ১৯৬০, ১ জানুয়ারি, কাশীপুরে সভায় গম্ভীরানন্দজী সভাপতি। হরিপদ ভারতী বক্তা। খুব ভালো বক্তৃতা দিতেন, গলায় দারুণ জোর। বলছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন

গৃহস্থদের জন্য—সাধুদের জন্য নয়; সাধুরা তো বাড়িঘর ছেড়েই এসেছেন ভগবানের জন্য। গম্ভীর মহারাজ উঠে বললেন—ঠাকুর গৃহস্থদের জন্যও আসেননি, সাধুদের জন্যও আসেননি—যারা মনেপ্রাণে ভগবানকে চায়, তাদের জন্য এসেছেন।

ব্যস। এককথায় সব যুক্তি খণ্ডন হয়ে গেল।

গম্ভীর মহারাজ ছিলেন খুব স্ট্রেট, বক্তৃতার যা বিষয় সেই বিষয়েই বলতেন। এলোমেলো, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতেন না। আবোল-তাবোল বলতেন না, অতিশয়োক্তি পছন্দ করতেন না। একটুও রংচং লাগিয়ে কথাবার্তা পছন্দ করতেন না। একদিন আমাকে একটা মজার গল্প বললেন—শোনো, একজন লোক ছিল। বড্ড বাড়িয়ে বলত। তার বন্ধুরা বলল—তুই বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলিস।

—যখন আমি বাড়িয়ে বলব তখন আমাকে একটা খোঁচা মারিস পিছন থেকে।

গল্প বলার সময় সে বলছে—বাঘশিকার করতে গিয়েছিলাম, বাঘটা আঠারো ফুট লম্বা।

বন্ধুরা দিয়েছে খোঁচা।

—ইয়ে, আমাদের কাছে ফিতে ছিল না, তবে পনেরো ফুট তো হবেই।

আবার খোঁচা। তারপর বললে—পনেরো ফুট না হোক, এই বারো ফুট তো হবেই। এমনি করতে করতে নেমে এসেছে ছয় ফুটে। আবার খোঁচা।

—তবে কি বলতে চাস বাঘটার ল্যাজ ছিল না?

অথচ গম্ভীরানন্দজী সত্যিই গম্ভীর, চাপা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নিরভিমান। আত্মম্ভরিতা দেখিনি। খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতেন।

দেখেছি, ট্রাস্টি মিটিং-এ যাবেন। সি আই টি রোডে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে ১০ নম্বর বাস দাঁড়াত। ওই বাসে হাওড়া স্টেশনে নেমে ৫৪ নম্বর বাসে বেলুড় মঠে যেতেন। ভাণ্ডারির কাছ থেকে একটা টাকা নিয়ে যেতেন। বাসভাড়া দিয়ে বাকিটা আবার এসে ফেরত দিতেন। কাছে একটা পয়সাও থাকত না। তারপর দয়ানন্দজী এবং গহনানন্দজী যখন সেবাপ্রতিষ্ঠানে, তাঁরা ওঁকে গাড়িতে তুলে ট্রাস্টি মিটিং-এ নিয়ে যেতেন।

গম্ভীরানন্দজীর জামাকাপড় খুব লিমিটেড ছিল। আর কী কঠোর! পেট ভালো ছিল না, খাওয়াদাওয়াতেও খুব সংযম। ভাগবত বলে—জিতং সর্বং জিতে রসে—যাঁর জিহ্বা জয় হয়েছে তাঁর অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও জয় হয়েছে।

১৯৬৩ সালে আমাদের যে ভাণ্ডার দেখত সে চলে গেল। ভাণ্ডারির কাজ করছি। ওঁর একটা স্পেশাল ঝোল হত। আলু, কাঁচকলা, পেঁপে, পটল—পাঁচ-ছরকম তরকারি দিয়ে অল্প তেলে সাঁতলিয়ে জল ঢেলে দাও, তারপরে সামান্য একটু মশলা দাও। আর দু-পিস মাছ দাও। ব্যস। একদিন বললাম—দিনের পর দিন এইরকম খাচ্ছেন। আপনার মুখে অরুচি লাগে না?

—আমি কি বলেছি আমার মুখে অরুচি লাগে? যা দিচ্ছ দিয়ে যাও।

আপনাদের একটা অরুচির গল্প বলি। বেলুড় মঠে একদিন ভরত মহারাজ ও নিত্যস্বরূপানন্দজী (চিন্তাহরণ মহারাজ) পাশাপাশি বসে। আমিও ওখানে আছি। নিত্যস্বরূপানন্দজী ভরত মহারাজকে বলছেন—দেখুন, ঠাকুর ১৮৮৬ সাল থেকে সুজির পায়েস খাওয়া আরম্ভ করেছেন। এখনও রোজ রাতে সুজির পায়েস! ঠাকুরের মুখে দারুণ অরুচি এসে গেছে। মেনু পালটান।

ভরত মহারাজ বলছেন—উঁ? হুম, আচ্ছা। ঠাকুরের সঙ্গে তোমার তাহলে এখন এধরনের কথাবার্তা হচ্ছে! তাহলে মেনুটা কী হবে?

—কইমাছ দিয়ে ফুলকপি, চিতলের পেটি, মৌরলা মাছের কাই—এইসব, মহারাজ।

অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের যত রান্না, যা যা ওঁরা ভালোবাসেন। এসব খেলে তবেই তো আবার ঠাকুরের মুখে রুচি আসবে! *(ক্রমশ)*